বাঙলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান ও স্থান

রবীন্দ্রযুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনজন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী প্রায় সমকালেই উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও তাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সংখ্যাধিক্যের বিচারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই (১৮৯৮-১৯৭১) ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। বস্তুতঃ তিনিও অপর দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিভূতিভূষণ ও মানিক) মতো বিষয়ের অভিনবত্বে স্বতন্ত্র ধারার পথিক হলেও বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের ধারাকেও তিনি সমভাবেই পুষ্ট করে গিয়েছেন। স্বল্পকালের জন্য তারাশঙ্কর চাকরি বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকলেও জীবনের বৃহত্তর অংশে তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যসেবাকেই ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোন বাঙালী সাহিত্যিকই ইতঃপূর্বে এমনভাবে সাহিত্য সাধনাকে জীবনসাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নি। এর ফলে তার সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে অপর সকলকে অতিক্রম করে যায় তারাশঙ্কর প্রধানতঃ ঔপন্যাসিকরূপে খ্যাতি লাভ করলেও তিনি কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী আদি বহু বিষয়কেই তার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। জনৈক গবেষকের হিশেবমতো দেখা যায় তিনি ৬৫ খানা উপন্যাস, ৫৩ খানা গল্পগ্রন্থ, ১২ খানা নাটক, ৪ খানা প্রবন্ধগ্রন্থ, ৪ খানা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, ২টি ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন। এ ছাড়া ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত যা কিছু রচনা করেছেন, তা সাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রয়ে গেছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। শুধু ঐ কালে রচিত কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-সন্তান তারাশঙ্কর যে যুগে ও যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বিভিন্ন সূত্রে যে পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন, তার সাহিত্যে সেই যুগ ও সমাজেরই বিশ্বস্ত এবং তথ্যনির্ভর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার জন্য যথেষ্ট নির্যাতনও ভোগ করেন এবং পরবর্তীকালেও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান নি। তারাশঙ্করের অপর একটি বিরল সৌভাগ্য এই যে, তিনি তার জীবৎকালেই তার জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন বিদ্বৎসভা তাকে যথাযোগ্য সম্মান দান করেছেন, তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার, আকাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার যেমন লাভ করেন, তেমনি অন্ততঃ চারটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি লিট ও ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতেও ভূষিত হন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ-ব্যতীত অপর কোন বাঙালী সাহিত্যিকের ভাগ্যে জীবিতকালে এত মর্যাদা লাভের সুযোগ ঘটেনি।

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল ১৯২১ খ্রীঃ 'মারাঠা দর্পণ' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে তিনি 'পথের ডাক' (১৯৪২), 'বিংশ শতাব্দী', 'কালরাত্রি', 'যুগবিপ্লব' প্রভৃতি মৌলিক নাটক, 'দুই পুরুষ' (১৯৪৩), 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৩), 'চকমকি' (১৯৪৫), 'সংঘাত', 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা' প্রভৃতি ছোট গল্পের রূপান্তরিত নাট্যরূপ এবং 'কালিন্দী', 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেন। নাটকে তার সহজাত প্রতিভার প্রকাশ ঘটলেও তার স্বক্ষেত্র ছিল কথাসাহিত্য—যার উপন্যাস এবং ছোটগল্প উভয় শাখাতেই ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং অর্জন করেছিলেন চরম সার্থকতা।

১৯২৬ খ্রীঃ তারাশঙ্কর 'ত্রিপত্র' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে ঐ পথে আর অগ্রসর না হলেও তার 'কবি', 'মঞ্জেরী অপেরা' প্রভৃতি উপন্যাসে রচিত সঙ্গীতগুলি কাব্যগুণে ও গীতিমাধুর্যে অপূর্বতা লাভ করেছে। কবিতা রচনায় তার দক্ষতার অপর প্রমাণও বর্তমান।

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' রচিত হয় ১৯৩০ খ্রীঃ। অতঃপর 'রাইকমল' (১৯৩৩) এবং 'আগুন' (১৯৩৭) রচনায় কিছুটা পরিচিতি লাভ করে। ১৯৩৯ খ্রীঃ 'ধাত্রীদেবতা' রচনার পরই তিনি বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাভূমি অর্জন করেন। এটির সঙ্গে 'গণদেবতা' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) সম্মিলিতভাবে বাঙলা সাহিত্যের সমকালীন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত হয়। এই উপন্যাস-ত্রয়ীর মধ্যেই যুগ-জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হয়ে তাকে মহাকাব্যের রূপ দান করেছে। তারাশঙ্করের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এতেই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাঢ় অঞ্চলের একটা সামগ্রিক রূপ ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি আভিজাত্য ও তার সদ্যোজাত যন্ত্রশিল্পের লড়াই, সমাজের বিভিন্ন আচার-আচরণ প্রভৃতি সবই ধরা পড়েছে বস্তুতঃ বিশেষভাবে এই ক'টি এবং এ জাতীয় অপর ক'টি রচনায় তারাশঙ্কর যে আঞ্চলিক জীবনের পরিচয় দিয়েছেন, পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের একটি শাখাই এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- "তার উপন্যাসে মুমূর্ষ সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি,জীবন ও সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায় মমতায় বর্ণিত হয়েছে। একটা যুগের অবসান হচ্ছে, আর একটা যুগ আসছে। পুরাতন গ্রামীণ জমিদারী আবহাওয়া চলে যাচ্ছে, আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে আসছে শিল্পপতির দল। গ্রামজনপদ রাতারাতি যন্ত্রদানবের কৃপায় আধা শহরে পরিণত হচ্ছে।..সেই সামাজিক মূল্যমানের পরিবর্তন তারাশঙ্কর অপূর্ব দক্ষতার সহিত ফুটিয়েছেন তার প্রধান প্রধান উপন্যাসে ও ছোটগল্পে। অবশ্য সেই ভাঙাচোরা পটভূমিকায় তিনি আবার নবজীবনের চিত্রও এঁকেছেন, নৈরাশ্যবাদী বিষণ্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর একদিকে তিনি বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ বেদিয়া, বাজিকর, সাঁওতাল, আউল-বাউল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি রহস্যময় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাদের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাও এতদিন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল।....কাহিনীর বিশাল পটভূমিকা ও আঞ্চলিকতা...চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য, ব্যক্তির মনোদ্বন্দ্ব, অনতিক্রান্ত যুগের সঙ্গে চলমান যুগের সংঘাত প্রভৃতি গভীর ব্যাপার তার উপন্যাসে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে,তাতে শুধু কথাকার বলেই তাঁকে বিদায় করা যায় না, তিনি অধুনাতন বাঙলী জীবন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন।" এই উদ্ধৃতির মধ্যেই তারাশঙ্করের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে অথচ পূর্ণরূপে কীর্তিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ৬৫ তাদের সবই যে শুধু আঞ্চলিকতাধর্মী তা' নয়, নানাবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসও তিনি অনেক রচনা করেছেন। আঞ্চলিকতাধর্মী গল্প উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৯৫৫) প্রভৃতি। তারাশঙ্করের যাবতীয় রচনার মধ্যেই শুধু নয়, অনেকের মতে সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের উক্ত 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদায় ভূষিত হয়। "এতে যেন প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সংহত মানবসমাজই নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমস্ত সমাজ-মনের এইরূপ ভাবঘন, অন্তঃসঙ্গতিশীল নিবিড় নিচ্ছিদ্র চিত্র যে কোন দেশের কথাসাহিত্যে বিরল।"

তারাশঙ্করের কতকগুলি উপন্যাসের মধ্যে অতীতের ঐতিহ্য এবং একালের প্রগতি—এই উভয় কালের দ্বন্দ্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। এ জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'জনপদ' (১৩৫২), 'পদচিহ্ন' (১৩৫৭), 'কালান্তর' (১৩৬৩), 'কীর্তিহাটের কড়চা' (১৩৮৪) প্রভৃতি উপন্যাস। 'আরোগ্য নিকেতন'ও এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রেম ও প্রবৃত্তি অবলম্বনে কয়েকটি জীবনধর্মী উপন্যাস রচনাতেও তারাশঙ্কর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এরূপ উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় একটি মহৎ কীর্তি—কবি'র। এ ছাড়াও 'আগুন', 'অভিযান'ও উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের ভিন্নস্বাদী উপন্যাসসমূহের মধ্যে আরও কয়টি বিশিষ্ট নাম- 'চাপাডাঙ্গার বউ'

(১৯৫৪), 'মঞ্জুরী অপেরা' (১৯৬৪), 'ফরিয়াদ', 'রাধা' (১৩৬৪), 'গল্পাবেগম' (১৩৭২), 'শতাব্দীর মৃত্যু' (১৯৭২), 'সপ্তপদী', 'বিপাশা', 'ডাকহরকরা' প্রভৃতি।

তারাশঙ্কর কয়েক শ ছোটগল্প রচনা করেছেন, যেগুলি অন্ততঃ ৫৩টি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনেও তিনি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। 'রসকলি', 'রাইকমল', 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ী', 'নারী ও নাগিনী', 'অগ্রদানী', 'ডাইনী', 'পৌষলক্ষ্মী', 'মাছের কাঁটা' প্রভৃতি গল্প লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের নিদর্শনরূপেই গৃহীত হয়।

তারাশঙ্করের প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার পল্লী'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত বক্তৃতা 'পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে'। এ ছাড়া আছে 'সাহিত্যের সত্য' এবং 'ভারতবর্ষ ও চীন' নামক প্রবন্ধ। লেখকের কয়েকটি আত্মজীবনীমূলক রচনা কৈশোর স্মৃতি', 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন' (১ম ও ২য় খণ্ড)। এ ছাড়া 'আমার কথা' অসমাপ্ত রচনায় তার ব্যক্তিগত জীবন, উপলব্ধি এবং ভাবনা কামনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যার স্বাদ অবশ্যই ভিন্নতর।